Rabindranath Tagore

গীতাঞ্জলি Gitanjali

রূপে রূপান্তরে

কবি এক জাগে

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

PUNASCHA
PUBLISHER

প্রস্তাবনা

২৫ বৈশাখ ১৪১৭। সকালবেলা রোজকার মতো আকাশবাণীতে প্রাত্যহিকী শুনছিলাম। প্রতি বছরই এই পক্ষে বিষয় হন রবীন্দ্রনাথ। এবার কবির সার্ধশতবর্ষে একমাস ধরে তিনিই আছেন। 'কেন রবীন্দ্রনাথ পড়ি'— ইতিমধ্যে প্রায় তিন সপ্তাহে অনেক চিঠি শোনা হল। সেদিন ৯ মে ২০১০, পূর্ব মেদিনীপুরের হাঁসচরা গ্রামের অপূর্বকিশোর দিন্‌দার চিঠি পড়ছিলেন উপস্থাপক। কোন্ লেখা কোন্ গান বেশি পড়েন বা শোনেন রবীন্দ্রনাথের, কেনই বা— পত্রকার সেসব কিছু লেখেন নি, লিখেছিলেন এ বছর এপ্রিল মাসে হরিদ্বারে কুম্ভস্নানে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেইসব কথা। সব রাস্তায় পুলিশি কর্ডন, হর কী পৌরীতে সাধারণ জনতার প্রবেশাধিকার নেই। চারপাশে মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ছে— মাথার উপর খর রৌদ্রের প্রতাপ— জনজোয়ারের তরঙ্গাভিঘাতে দাঁড়াবার জো নেই, এগোবার উপায় নেই, নিরুপায় মনে যখন ভাবছেন— এই কি পুণ্যস্নানের পরিবেশ! এমন সময় হঠাৎ প্রাণের ভিতর থেকে উঠে এলেন রবীন্দ্রনাথ—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

ভিড় ঠেলে পথ এগোচ্ছে—অপূর্বকিশোর হঠাৎ একজায়গায় দেখতে পেলেন বিশ্বভারতীর একদল ছেলেমেয়ে, আলাপ হল তাদের সঙ্গে। ধুলোর ওপর বসে পড়েছে ওরা— প্রফুল্ল মনে গলা ছেড়ে গান গাইছে একের পর এক, গাইছে—

এই লভিনু সঙ্গ তব,
　　সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
　　ধন্য হল অন্তর,
　　সুন্দর, হে সুন্দর।

সেদিন আর প্রাত্যহিকীর অন্য চিঠিগুলোয় মন লাগল না তেমন, কখন যে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গদানে ধন্য করে দেন। মন জুড়ে বসেছেন তিনি, *গীতাঞ্জলি*-র কবি। *গীতাঞ্জলি* বলতে তো শুধু ওই একটা বই নয়, আবু সয়ীদ আইয়ুব যেমন বলেন, যেমন বলেন শঙ্খ ঘোষ,—গীতাখ্য তিন কাব্য নিয়েই *গীতাঞ্জলি*। তিন কাব্যে প্রকাশকালের ব্যবধান যে একেবারে নেই তা নয় (*গীতাঞ্জলি* ১৯১০, *গীতিমাল্য-গীতালি* ১৯১৪), সময়ের ওটুকু হেরফের দাগ কাটে না, মনের মধ্যে ওরা তিনে মিলে একই সুর বাজিয়ে দিয়ে যায়। আর *গীতাঞ্জলি* কাছে এলে *Gitanjali* দূরে থাকে না।

গীতাঞ্জলির প্রকাশ শ্রাবণ ১৩১৭, শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেল। আর দুটো বছর গেলে India Society সংস্করণ *Gitanjali* একশ বছর পেরোবে। তার কয়েকমাস পরেই বেরিয়েছিল Macmillan সংস্করণ *Gitanjali*, শতবর্ষের দৌড়ে খুব পিছিয়ে নেই সেও। শতবার্ষিকী পালনের বড়ো আয়োজন হবে হয়তো, তার একটু-আধটু আভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে।

একটা উপলক্ষ ঘটেছে বলেই নয়, *গীতাঞ্জলি-Gitanjali*-র প্রসঙ্গ কবেই বা আমরা ভুলে থাকি। ত্রয়ী কাব্যের দরিয়া পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ তো কবেই ভিন্ন সাগরে পাড়ি দিলেন। কতবার কত বন্দরে ভিড়ল তাঁর তরণী। আরও তিরিশ বছর প্রায়, কত রূপ-রূপান্তর, সুর-সুরান্তরের সৃষ্টিস্রোত বইল, ব্যথার বাঁশিতে আনন্দের গান বাজল কত না। তবু যে কোনোদিন জীর্ণ হল না *গীতাঞ্জলি*, *গীতাঞ্জলি*-র কবি রবীন্দ্রনাথ, এ পরিচয় যে কোনোদিন বিবর্ণ হয়ে গেল না, কবির আরও শত পরিচয়ের আড়ালে চাপা পড়ল না— সে কি ওই গানের টানে—'এই লভিনু সঙ্গ তব. . .'? 'এক হিসেবে সেটা সত্যি কথা'— '*গীতাঞ্জলি* সেই চিরাগত ঐতিহ্যের কবিতা'। অনেকদিন ধরেই হয়তো একে উপাসনার অঙ্গী করে *শান্তিনিকেতন* আর *Sadhana*-র সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে পড়ে আসছি বা গেয়ে আসছি আমরা, তবু এই কথাটাই শেষ কথা নয়, শঙ্খ ঘোষের আলোচনায় শুনি। একসময় সমালোচকরা যে ভেবেছিলেন *গীতাঞ্জলি*-র পর্ব কবিপ্রতিভার নির্বাসনপর্ব, কবিতা থেকে ছুটি নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ফিরে গিয়েছিলেন নিতান্তই গানের জগতে, সে মূল্যায়ন যে কেন ভুল সে প্রসঙ্গ তুলে তিনি বললেন, '. . . সেদিন ভাবেননি এঁরা যে হয়তো-বা এ লেখাগুলি তৈরি করছে কবিতারই এক ভিন্ন আদর্শ, গড়ে উঠছে আরেক রকম কবিতা, যা কোনো আলোড়ন তোলে না, যা পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কোনো সংলাপ নয়, যা কেবল নিভৃত মুহূর্তের সুকুমার সঙ্গী হিসেবে থেকে যায় কারো কাছে।'

তাঁর এই নতুন কবিতা যে কাব্যের ভুবনে একটা নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোঝেননি। বলেছিলেন 'বাংলা ভাষাতেও এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়— এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা, আমারি প্রয়োজনে লেখা।' সেকথা স্বীকার করতে রাজি হয়নি *এ আমি-র আবরণ*, লেখক মনে করেন 'এর আছে সামগ্রিক এক নিজস্ব গড়ন। আর সেই গড়নকে আমরা দেখতে পাব তাঁর কবিতারই এক বিশেষ পরীক্ষা হিসেবে, সেই পরীক্ষা, কবিতা যেখানে তার সমস্ত অলংকার ছেড়ে দিয়ে গানের তুল্য হয়ে দাঁড়ায় : নিবিড়, সরল, বেদনাময়।... আভরণ-বর্জনের এই যে আবেগ, তার বিখ্যাত পরিচয় *গীতাঞ্জলি*-র পাঠকমাত্রেই মনে করতে পারবেন: 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার'।' কথাটা আর একটু ব্যাখ্যাত হল পরে আবার। তিনি বললেন, 'এ বইটিতে কবি এসে পৌঁছলেন বাংলা কবিতার বিরলতম এক মুহূর্তে, যেখানে সনাতন গীতিসাহিত্য আর অধুনাতন কাব্যসাহিত্য একটা বিন্দুতে এসে মিলেছে, ঐতিহ্য যেখানে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে নবীন এক আধুনিকতায়।'

আমাদের মতো ওদেশেও অনেকে এ গানকে উপাসনার গান বলে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন অবশ্য। তেমন নজির অনেক আছে। স্বয়ং কবি ইয়েটস্ *Gitanjali*-র ভূমিকায় এই কবিতার তুলনা করেছিলেন Imitation of Christ, Psalms of David প্রভৃতির সঙ্গে। ব্রিটিশ পত্রিকার গ্রন্থসমালোচনাতেও প্রায়শ এই বইয়ের কবিতা তুলনীয় হয়েছে প্রাচীন শতাব্দীর ধর্মীয় কবিদের রচনার সঙ্গে। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডেও আলোচনার একটা ধারা এই পথের অনুগামী। তবু এটাই শেষ কথা নয়, পশ্চিম মহাদেশ *গীতাঞ্জলির* সঙ্গে তার পরিচয়ের সীমানা এইখানেই নির্দিষ্ট

করেনি। পশ্চিমদেশেই হোক বা পূর্বে, ধর্ম যাঁদের কাছে রবিবারে গির্জায় গিয়ে কৃত্যপালন নয়, আচার মেনে মূর্তিপূজা নয়, ধর্ম যাঁদের কাছে আত্মান্বেষণ, নিজের কাছ থেকে নিজের মুক্তির সন্ধান, *গীতাঞ্জলি*-র আত্মিকতা তেমন মানুষকে তার মুঠোয় ধরতে পারে। আত্মসন্ধানীর মনকে তার সমকালেও সে আকৃষ্ট করেছে, পরবর্তীকালেও। আমার মধ্যেকার যে বড়ো আমিটাকে আমার মধ্যে কুলোয় না, 'সেই অকুলান মূর্তিকে ঈশ্বর নাম দিতে পারেন কেউ, কেউ বা নাও দিতে পারেন। এইটে কেবল সত্যি যে ধর্মীয়তার বাইরে এই সত্তার অনুভব ভাবুক মানুষমাত্রেরই অনিবার্য অনুভব, তার প্রেম বা প্রকৃতি বা অন্য যে-কোনো বোধেই জড়িয়ে থাকে তা'।

ভাবুক মানুষের এই যে অনিবার্য অনুভব এর মূলে আছে মানুষ মাত্রেরই আপন অস্তিত্বে জড়ানো আমি-তুমির টান। চেতনার অভাব যেখানে আবরণ সৃষ্টি করে না, তেমন মনও ছোটো ছোটো গ্লানির মধ্যে অসাড় হয়ে থাকে, 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া' ঘুরে মরে। আবার 'যখন জানি যে 'সত্য মুদে আছে' আমাদেরই দ্বিধার মাঝখানে', তখনই ভিতর থেকে একটা বোধ জেগে ওঠে— 'সেই হলো জাগরণ'। 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ'— *গীতাঞ্জলি*-র উচ্চারণ স্মরণ করিয়ে দেয় *এ আমির আবরণ*। প্রশ্ন করে 'কীসের দিকে এই জেগে ওঠা?' উত্তর আসে 'হয়ে-ওঠার মুক্তিতে'। 'মানুষ তখন হতে চায় শুধু আপন সমগ্রতার অভিমুখী, যে-সমগ্রতায় বাইরের পৃথিবীকেও তার চাই। হয়ে-ওঠার এই আগুন যাকে ছুঁয়ে যায় একবার, তাকে পৌঁছতেই হয় 'আমি'র দিকে, অর্থাৎ 'তুমি'র দিকে, অথবা 'আমি-তুমি'র মিলন-মুহূর্তের দিকে।'

Gitanjali-সঙ্গমে ঐতিহ্য প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছিল নবীন এক আধুনিকতায়। পশ্চিমের রসগ্রাহী চিত্ত প্রথম থেকেই অঞ্জলি ভরে তার রসাস্বাদন করেছে। পাণ্ডুলিপির টাইপ-করা অনুলিপি পড়ে বিশিষ্ট সাহিত্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এ.সি. ব্রাডলের মনে হয়েছিল আবার বোধহয় সুদীর্ঘকাল পরে একজন বড়ো মাপের কবির আবির্ভাব হল তাঁদের মধ্যে। নামকরা প্রবীণ ধর্ম ও সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ লেখক স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক ওই একইভাবে কবিতাগুলি পড়বার সুযোগ পেয়ে লক্ষ করেছিলেন এর মধ্যে কোনো বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত ধর্মমত বা বিশ্বাসের যোগ বা প্রভাব নেই। বরং তাঁর একটু সংশয় ছিল, এই একান্তভাবের কবিতাগুলি কি ছাপতে রাজি হবেন কবি।

আরও আশ্চর্য সেদিনের একেবারে অখ্যাত তরুণ কবি স্যাঁ-জন প্যার্সের প্রতিক্রিয়া। তখন মাত্র কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁছেছেন, প্যার্স যে কবির কথা জেনে তাঁর দু'একটি কবিতা পড়ে নিজের গরজে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ফ্রান্সে যাবার অনুরোধ জানালেন, বললেন, ফরাসি সাহিত্যের প্রয়োজন আছে তোমাকে, এ তো কম বিস্ময়ের কথা নয়। Gitanjali (India Society edition)-র একটি কপি তাঁর হাত দিয়েই প্রথম পৌঁছেছিল ফ্রান্সে। সেখানে কেউ তখনও রবীন্দ্রনাথের নাম শোনে নি। এ বই ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য অসমবয়সী বন্ধু এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্‌কে তিনিই অনুরোধ করেন এবং নিজের বইটি তাঁকে দেন। শর্ত একটা ছিল, তাঁর বই তাঁকে ফেরৎ দিতে হবে।

Gitanjali-র কবিতা আত্মীকরণের জন্য কোনো পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না, কোনো বিশেষ দেশের কাব্য-পুরাণ-তত্ত্বকথা জানবার দরকার নেই, সম্ভবত আঁদ্রে জিদের মতো সেটা আরও অনেকেই লক্ষ করেছিলেন। বিরাটকায় *মহাভারত* এবং *রামায়ণ*-এর তুলনায় *গীতাঞ্জলি*-র

তন্বী অবয়ব দেখে তৃপ্ত হয়েছিলেন আঁদ্রে জিদ। 'এর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন আলোর নানা স্তর, এর মধ্যে তিনি শুনেছিলেন শুমান বা বাখ্-এর সংগীতের তুল্য কোনো ধ্বনি। কেবল জিদ্ নন, প্রতীকবাদের কিছুমাত্র ছায়া যাঁদের ছুঁয়েছিল কখনো, তাঁদের সকলেরই কাছে মোহময় ছিল শিল্পের বলয়ে এই সাংগীতিক আবহ।' বলতে বলতে *এ আমির আবরণ* আমাদের নজর টেনে আনে ইউরোপে রোমান্টিক যুগের কবিদের আত্মবিহ্বলতা পেরিয়ে-আসতে-চাওয়া প্রতীকবাদীদের দিকে। বলে, পাশ্চাত্যের নতুন কবিরা পুরোনো কবিদের অস্বীকার করে 'কবিতার এক তল থেকে ভিন্ন এক তলে পৌঁছবার সাধনা করছিলেন'। আর আমরা একই কবির মধ্যে সেই দুই তলের চিহ্ন দেখতে পেলাম— 'নিজেকেই তিনি অস্বীকার করে এগিয়ে এসেছিলেন *চিত্রা* থেকে *গীতাঞ্জলি*-র দিকে, রোমান্টিক বিশ্ব থেকে প্রতীকীদের জগতে।'

গীতাঞ্জলি-র ৫৩, *গীতিমাল্য*-র ১৫, *নৈবেদ্য*-র ১৭ (দুটি সনেট মিলে অনুবাদে একটি), *খেয়া*-র ১১, *শিশু*-র ৩ আর *কল্পনা চৈতালি স্মরণ উৎসর্গ অচলায়তন*-এর একটি করে নিয়ে *Gitanjali*, মোট রচনা সংখ্যা ১০৩। আখ্যাপত্রে জানানো হয়েছিল যে, এই বই কবির বাংলা কবিতার স্বকৃত গদ্যানুবাদ-সংকলন এবং এতে W.B.Yeats-এর ভূমিকা আছে। ইংরেজ ভাবুক সমাজে এই কবিতাগুলি বইপ্রকাশের অনেক আগেই উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি পেয়েছিল। নোবেল পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচনার প্রস্তাব যখন এল, সুইডিশ আকাদেমির বিশেষ ভারপ্রাপ্ত সদস্যরা খুঁটিয়ে এর কাব্যোৎকর্ষের বিচার করেছিলেন সিদ্ধান্তগ্রহণের আগে। ভাবের মিলগত বা রচনাক্রমগত কোনো বিন্যাসপরিকল্পনার ইঙ্গিত *Gitanjali*-তে নেই। আঁদ্রে জিদ্ তাঁর ফরাসি অনুবাদের ভূমিকায় প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন। কোনো পাঠক নিজের প্রবণতা অনুযায়ী হয়তো কবিতাগুলির ভিতরকার মিল-অমিল বা বৈশিষ্ট্যগত যোগ আবিষ্কার করতে পারেন। বাস্তবে ঘটেছেও তাই।

Gitanjali প্রকাশক ম্যাকমিলানকে অসামান্য ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়েছিল। বইপ্রকাশ ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা, এই দুয়ের মাঝে, অর্থাৎ মার্চ থেকে নভেম্বরের মধ্যবর্তী ক'মাসের মধ্যে চাহিদা মেটাতে এ বইয়ের এগারো-বারোটি মুদ্রণের প্রয়োজন হয়েছিল। তারপরে এবং বছরে বছরে এ বই অসংখ্যবার মুদ্রিত হয়েছে। *Gitanjali* প্রকাশনার সব ইতিহাস আমার জানা নেই, তবে যেটুকু জানি, সম্ভবত ম্যাকমিলান কোনোদিন এ বইয়ের কোনো সটীক সুমার্জিত সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়নি, যে সংস্করণে প্রয়োজনে কিছু শব্দার্থ, মূল কবিতা সম্পর্কে কোনো তথ্য, কবিতা রচনার তারিখ, ক্ষেত্রবিশেষে উপলক্ষ ইত্যাদি থাকবে। গ্রন্থসম্পাদক ইয়েটস্ প্রথমেই কবির একটি জীবন-পরিচয় যোগ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে-পরামর্শের প্রতি মনোযোগ দেননি কেউ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কি কখনো একটি সটীক সংস্করণের কথা ভাবেন নি, অথবা তাঁর গ্রন্থ-প্রকাশনার দায়িত্বে-থাকা আর কেউ?

প্রসঙ্গত দুটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হিমেনেথ দম্পতি— কবি হুয়ান রামোন (Juan Ramón Jimenez) ও তাঁর স্ত্রী সেনোবিয়া (Zenobia Camprubi Jimenez) স্পেনীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ইংরেজিতে প্রকাশিত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। *Gitanjali* 64-তে *The carnival of lamps*— এই শব্দগুচ্ছ আছে, সেখানে কোনো ব্যাখ্যা নেই তার। ১৯৫৫ সালে যখন স্পেনে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশিত হয়, 'তখন তার পাণ্ডুলিপির মার্জিনে হুয়ান রামোন লিখেছিলেন যে, তিনি আন্দ্রে জিদের লেখা থেকে জানেন যে *Carnival of*

Lamps ভারতবর্ষের একটি জনপ্রিয় উৎসব।' আর একটি কথা, এও *শাশ্বত মৌচাক* থেকে উদ্ধৃত করছি : 'রবীন্দ্রনাথকে লেখা সেনোবিয়ার একটি চিঠি থেকে জানতে পারি যে হুয়ান রামোন রবীন্দ্রনাথের রচনার কালানুক্রম জানতে চাইছিলেন। তিনি বোধকরি একমাত্র কবি, ইউরোপীয় অনুবাদক যিনি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ থেকে জানবার কোনো উপায় নেই কবে কোন্ লেখাটি বাংলায় লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ প্রকাশক অনেক সময় জানাবারই প্রয়োজন বোধ করেন নি যে তাঁর মূল রচনা বাংলায়। প্রকাশকের কল্যাণে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদগুলি কালাতীত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু হুয়ান রামোন জানতে চেয়েছিলেন।'

সরল স্বচ্ছার্থ গদ্যানুবাদের রীতি রবীন্দ্রনাথের, কখনো বা অনেকটা সংক্ষিপ্ত। মার্টিন কেম্পশেন (Martin Kempchen) প্রথম যখন বাংলা মূল কবিতা পড়ে তার ইংরেজি অনুবাদ পড়েন, তিনি প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন। সম্প্রতি দেশ পত্রিকার ২ মে ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি একথা লিখেছেন। জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদক কেম্পশেনের মতে রবীন্দ্রনাথ 'তাঁর মূল বাংলা রচনার তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কবিকৃতির নিরিখে' নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আর তার পরেই তাড়াহুড়ো করে ইউরোপীয় অনেক ভাষায় *Gitanjali*-র অনুবাদ হলেও কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় আজও পশ্চিম গোলার্ধে অনাবিষ্কৃত। এই সঙ্গেই কেম্পশেন স্বীকৃতি জানান, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সুললিত। ভাববস্তুর গুণে, চিত্রকল্পের অভিনব ঐশ্বর্যে তাঁর কবিতা আদ্যন্ত মৌলিক এবং ইউরোপীয় পাঠকের কাছে সেদিনও যেমন এখনও তেমনি অনাস্বাদিতপূর্ব। প্রসঙ্গত এইখানে বলি যে, প্রথম পর্যায়ে ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় *Gitanjali*-র যে সব অনুবাদ হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোনো কোনো লেখায় মন্তব্য চোখে পড়েছে। তার মধ্যে বিশেষ করে আঁদ্রে জিদ্-কৃত ফরাসি অনুবাদের উৎকর্ষ নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ দেখিনি। পাশাপাশি স্প্যানিশ এবং ডাচ অনুবাদের উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে সমভাবেই। স্প্যানিশ অনুবাদ করেন সেনোবিয়া কামপ্রুবি হিমেনেথ এবং তাঁর স্বামী হুয়ান রামোন হিমেনেথ এ কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন; ডাচ অনুবাদ করেন ফ্রেডরিক ভন ইডেন (Frederik Van Eeden)। আঁদ্রে জিদ্, হুয়ান রামোন হিমেনেথ এবং ভন ইডেন তিনজনেই ইউরোপের ডাকসাইটে কবি। সাহিত্য আকাদেমির রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংকলনে Pierre Fallon s.j.-এর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল: Tagore in the West। বাংলা সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., মূল রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচয় ছিল এই লেখকের। একটু দীর্ঘ হবে, তবু এঁর লেখা থেকে একটি সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

> *Gitanjali,* recreated into English by the poet himself, has been the most successful of all the Tagore translations. The Western Gitanjali loses much of the musical beauty and evocative power of the original poems; yet it is a jewel, even a jewel of English religious poetry. Some of those who translated it from the English into other European languages were great poets themselves. The French and the Dutch versions were extremely beautiful, the Spanish 'Ofrenda Lirica' is beautiful too; Van Eeden, Gide and Jimenez were great names in their respective countries. *Gitanjali* lent itself to good translation : the simplicity of its language, the

> universal character of its spiritual message, the subdued quietness of its tone made it easier for translators to render its poems into their various languages than it would have been the case with poems richer in narrative or dramatic content. Within a few years *Gitanjali* was read in nearly all the European languages; the French translation alone passed through some 35 editions, and similar success obtained in other languages as well. To-day still Tagore is, for the west, the author of Gitanjali.

দি গোল্ডেন বুক অব টেগোর-এ অরবিন্দ ঘোষ যেমন মূল্যায়ন করেছেন, বাংলা-ইংরেজি দুই ভাষাতেই যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এসব কবিতা পড়েছেন, তাঁরা কেউই বোধহয় তা মেনে নিতে দ্বিরুক্তি করবেন না: 'One has only to compare this English prose, beautiful as it is, with the original poetry to see how much has gone out with the change; something is successfully substituted which may satisfy the English reader, but can never satisfy the ear or the mind that has once listened to the singer's own native and magical melodies.' শ্যামল কুমার সরকারের 'ইংরিজি অনুবাদে গীতাঞ্জলি' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। যেমন তিনি বলেছেন, 'এ কথা বিতর্কের অতীত যে এক ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় তার কাব্যগুণ অনেকটা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য', সমান্তরালে এও তিনি মনে করেন, অনুবাদের পর *Gitanjali*-র কবিতা রসবিচারে উত্তীর্ণ কিনা, এ আর তাঁর বিচার্য নয়। 'নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতি এ প্রশ্নের মীমাংসা অনেক আগেই করেছে। ইয়েটস্, জিদ্ থেকে শুরু করে অনেক কবি, সমালোচক, সাহিত্য-অনুরাগী Gitanjali-র কবিতার কাব্যোৎকর্ষ সম্পর্কে অভিমত দিয়েছেন।' অনুবাদে মূল কবিতার কতখানি রসহানি হয়েছে, এই প্রবন্ধে তারই নির্ণয়ের চেষ্টা ছিল তাঁর। প্রসঙ্গত তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, 'মূল কবিতার একটি বড়ো আকর্ষণ ছন্দের বৈচিত্র্য ও কারুকার্য অনুবাদে একেবারেই হারিয়ে গেছে। এ ক্ষতি যে কত বড়ো ক্ষতি তা ইংরিজি অনুবাদের পাঠক জানবেন না।'

অনুবাদের রীতিনীতি প্রসঙ্গে নানা উপলক্ষে কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার দুএক টুকরো আলোচনাক্রমে এই বইতেও কখনো এসে পড়বে। এটা লক্ষ করা যায় যে, তাঁর কবিতার সমিল কোনো অনুবাদ তাঁর ঘোর অপছন্দ, তিনি মনে করেন একমাত্র যা চলতে পারে তা গদ্যানুবাদ। রবি দত্তের অনুবাদ সংকলনে তাঁর কয়েকটি গান ও কবিতা স্থান পেয়েছিল, সে অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের একেবারেই পছন্দ হয়নি। সে অনেকদিনের কথা, পরে যখন ১৯২৬ সালে এডওয়ার্ড টমসনের বই বেরোল: *Rabindranath Tagore : the Poet & the Dramatist,* রবীন্দ্ররচনার প্রচুর টমসন-কৃত অনুবাদ ছিল তাতে। সে বই রবীন্দ্রনাথের কঠোর সমালোচনার শিকার হয়েছিল। রোটেনস্টাইনকে ২০ এপ্রিল ১৯২৭ তিনি এই বই প্রসঙ্গে যা লেখেন, সেটা পড়ে উইলিয়াম র‍্যাডিচে লিখেছেন, 'my blood froze.' তারপর তিনি যখন মূল বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পড়লেন, আবার একবার পড়লেন টমসন, তাঁকে স্বীকার করতে হল, রবীন্দ্রনাথ ভুল বলেননি। 'On reading Thompson again, after my translations were substantially complete, I came, alas, to the conclusion that Tagore was right.'

মোটের উপর অজিতকুমার চক্রবর্তীর করা অনুবাদ বোধহয় রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পেত। তাঁর নিজের বা অজিতকুমারের অনুবাদ-খসড়া আনন্দ কুমারস্বামী দেখে দেবার পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। সেই যে একবার অজিতকুমার-কৃত একটা কবিতার অনুবাদ (যেটা অজিতকুমারের এক ইংরেজ বান্ধবী এবং একাধারে কবি ও

ঋষি এডওয়ার্ড কার্পেন্টার দেখে দিয়েছিলেন) ওই পত্রিকার জন্য পাঠিয়ে সস্নেহ কৌতুকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, ওটার উপরই অজিতের বেশি ঝোঁক, দুই ইংরেজের হাতে ফিলটার্ড হয়ে নিশ্চয় সে কবিতার বাঙালিত্বদোষ ঘুচে গেছে, সেই চিঠিটার কথা মনে এল। কবি নিজেও তো *Gitanjali* থেকে সব ভারতীয় বা দেশীয় অনুষঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জন করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে নিজের গল্প-উপন্যাস সম্পর্কেও তাঁর একই মনোভাব। *গোরা* অনুবাদ প্রসঙ্গে এই বিষয় নিয়ে পিয়র্সন যথেষ্ট জোরালো যুক্তিসহ প্রশ্ন তুলেছিলেন। পিয়র্সনের সেই চিঠির কথা এখন থাক, এডওয়ার্ড টমসনের কথাটা এখানে উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন : 'his treatment of his western public has sometimes amounted to an insult to their intelligence. He has carefully selected such simple sweet things as he appears to think they can appreciate.'

পাশ্চাত্যের পাঠকের পাঠোপযোগী করবার জন্য নিজের রচনা থেকে অনুবাদকালে সব দেশীয় অনুষঙ্গ সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে রবীন্দ্রনাথের এই যে ঝোঁক, এ ব্যাপারে সম্ভবত সবচেয়ে করুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর। তখন রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনায়, বুয়েনস আইরেসে তাঁর অতিথি। কয়েকদিনের জন্য ভিক্টোরিয়া তাঁকে চাপাড মালালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেইখানে একদিন বিকেলে চা-পানের জন্য তাঁকে ডাকতে তাঁর ঘরে ঢুকেছেন— 'ঠিক তখনি একটা কবিতা লেখা শেষ করেছেন উনি।' সদ্যরচিত কবিতাটির অনুবাদ শোনবার ইচ্ছা ভিক্টোরিয়া প্রকাশ করলে 'উনি অনুবাদ করতে শুরু করলেন প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে, কখনো-বা ইতস্তত করে। একটা জগৎ খুলে গেল আমার সামনে। বললাম, পরে যেন এটি লিখে রাখেন। একেবারে হঠাৎ, যেন দৈবে, সরাসরি স্পর্শ পাওয়া গেল ওঁর কবিপ্রকৃতির, তাকে ধরতে হল না অনুবাদের দস্তানাঘেরা হাতে। আলগা আঙুলে শব্দগুলিকে ছুঁতে পারার আনন্দ যেন নষ্ট হয়ে যায় অনুবাদ-কবিতায়। স্পর্শাতীত আর স্পর্শযোগ্যকে, স্পর্শাতীত কবিতার সত্য আর স্পর্শযোগ্য দৈনন্দিন অসত্যকে ক্ষীণ সেতুতে বেঁধে দেয় যে শব্দ, একজন কবিই তো জানেন তার বুনুনি।' পরদিন সকালবেলা অনূদিত কবিতাটা আবার যখন কবির হাত থেকে পেলেন, ভিক্টোরিয়া পড়ে দেখলেন পূর্বদিনের শোনার অনেকটা অংশই নেই তার মধ্যে— 'এমন সব ব্যাপার ছেড়ে দিয়েছেন যা ছিল কবিতাটির প্রাণ।' তাঁর অভিযোগ শুনে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন তাতে বোঝা গেল 'ওঁর মনে হয়েছে সেসব অংশ পশ্চিমবাসীদের ভালো লাগবে না হয়তো। এক ঝলক রক্ত উঠে এল আমার মুখে, কেউ যেন মেরেছে আমাকে।'— লিখেছেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, যদিও এটা তিনি বুঝেছিলেন কবি আন্তরিকভাবেই উত্তরটা দিয়েছিলেন, তাঁকে অপমান করতে নিশ্চয় তিনি চাননি।

তাহলে কি ধরে নেব কবিতা অনুবাদের ব্যাপারে বরাবর এটাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি? কিন্তু এই মানুষই, তাঁর আদেশে ক্ষিতিমোহন সেন যখন বাংলায় অনুবাদ করছিলেন কবীর দোঁহা, ৮ ভাদ্র ১৩১৭-র চিঠিতে তাঁকে যা লিখেছিলেন, সে তো অনেকটাই অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

চাপাড মালালে দিনসাতেক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দুটি কবিতা লেখেন সেখানে। ১৬ ডিসেম্বর 'আকন্দ', ১৭ ডিসেম্বর 'কঙ্কাল'। সম্ভবত দ্বিতীয় কবিতার প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে এই ঘটনার সঙ্গে, এ অনুমান করেছেন শঙ্খ ঘোষ। *পূরবী* কাব্যের এই কবিতার কবি-কৃত অনুবাদ আছে *Poems* সংকলনে।

> মূলকে অতি সামান্য পরিমাণেও ছাড়িয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না, তাতে যদি ভাব অস্পষ্ট হয় সেও ভালো। ভাবের কিছু পরিমাণ অস্পষ্টতাই দরকার, অতি স্পষ্ট হলে তার অর্থ ছোটো হয়ে যায়— কবিতা তো তত্ত্ববিদ্যার ব্যাখ্যা নয়, এইজন্যে তার কাছে স্পষ্ট কথার দাবি খাটবে না।
>
> কবিতায় কোনো abstract কথা মানায় না— এইজন্যে কবীরের সাহেব কথাটিকে আমি বাংলায় স্বামী প্রভৃতি কোনো নিকট সম্বন্ধসূচক শব্দের দ্বারাই তর্জমা করা ভালো মনে করি— . . .
>
> 'আপা' শব্দ তো অভিমান অর্থে ব্যবহৃত হতেই পারে। কিন্তু অভিমান কথাটা abstract। 'আপনা' কথাটাও অভিমান বোঝায় অথচ তার চেয়ে অনেক সহজে অনেক বেশি বোঝায়।
>
> 'শব্দ' কথাটাকে সংগীত বললে খাটো করা হয়— এবং দেখেছি কবীর যে বিশেষ কবিতায় 'শব্দ' নিয়ে মেতেছেন সেখানে সংগীত কথাটা সব জায়গায় ভালো করে খাটে না— 'শব্দ' কথার মধ্যে একটি আদিম ধ্বনির ভাব আছে— সে যেন সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র, ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রথম কান্না, তা ওঙ্কারের মতো— অর্থাৎ তা অত্যন্ত সহজ এবং ব্যাপক— ...তিনি ওটাকে যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন মূল শব্দটা রেখে দেওয়াই ভালো। বরঞ্চ এ সম্বন্ধে ভূমিকায় আলোচনা করা চলে।

এখনকার কালে সাহিত্যের ভাষান্তর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা অনেক স্পষ্ট এবং অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকার (Introduction, notes, Glossary এবং অনুবাদক প্রয়োজন মনে করলে তদতিরিক্ত আর কোনো প্রাসঙ্গিক সংযোজন, সব কিছুরই) ভূমিকা বিশেষ মূল্যবান। বিশ্বভারতী প্রকাশিত দুটি অনুবাদের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে: *Poems* (সংকলন, ১৯৪২। বারোটি ছাড়া সবই রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ। ১৯৭০-এর পরে আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই); *Shyamali* (*শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ: শীলা চ্যাটার্জি। শেষ পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৬)— দুটি গ্রন্থেই কিছু notes দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর সময় হুমায়ুন কবীরের সম্পাদনায় যে অনূদিত কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, সে বই বিশ্বভারতী ও UBSPD-কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ২০০৫ সালে : Poems of Rabindranath Tagore — টীকা সম্বলিত না হলেও মূল কবিতাগুলি কোন কাব্যের এবং কোন সময়ের, সেটুকু তথ্য অন্তত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে তিনটি অনুবাদ-সংকলন সবচেয়ে স্বীকৃতি ও গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলি হল:

Selected Poems of Rabindranath Tagore William Radice; Penguin Books: 1985

Rabindranath Tagore: I Won't Let You Go, Selected Poems Ketaki Kushari Dyson; UBSPD : 1992

Rabindranath Tagore: Selected Poems; Oxford University Press Sukanta Chaudhuri [Also General Editor with a few co-translators] : 2004

অনুবাদের জন্য র‍্যাডিচে কোনো গান নির্বাচন করেন নি, তিনি মনে করেন গানের যথার্থ অনুবাদ হয় না। কেতকী কুশারী ডাইসন তা মনে করেন না কেন, সে প্রসঙ্গ তাঁর ভূমিকায় এসেছে, গানের অনুবাদ আছে তাঁর সংকলনে। তৃতীয় সংকলনেও আছে। *Gitanjali*-তে অনেকগুলি গানের অনুবাদ স্থান পেয়েছে, মূল রচনার পরিচয় দেওয়া হয়নি বলে পাঠকের

পক্ষে কোন্‌টি গানের অনুবাদ, কোন্‌টি কবিতার, তা জানা সম্ভব হয়নি সেদিন। র‍্যাডিচের সংকলনে *Gitanjali*-র একটি পুনরনুবাদ স্থান পেয়েছে: Arrival (আগমন। *খেয়া*: No. 51); কেতকী কুশারী ডাইসনের সংকলনে গৃহীত হয়েছে চারটি: *Naibedya* No. 89, No. 90 (যা একত্রে No. 95), *Smaran* 5 (No. 87), Song 5 (হেথা যে গান। No. 13); সুকান্ত চৌধুরীর সংকলনে *Gitanjali*-র তেরোটি রচনার পুনরনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; The Nest and the Sky (*নৈবেদ্য* ৮১। No. 67), Athirst (*নৈবেদ্য* ৮৬। No. 40), Where the Mind is Without Fear (*নৈবেদ্য* ৭২। No. 35), The Children by the Shore (*জগৎ পারাবারের তীরে*। *শিশু* No. 60), Unnecessary (অনাবশ্যক। *খেয়া* No 64), The Coming (আগমন। *খেয়া* No. 51), The Miser (কৃপণ। *খেয়া* No. 50), Song: This Stormy Night (আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার No. 23), Song: The Suit (*জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ* No. 16), Song : When Life Has Withered (*জীবন যখন শুকায়ে যায়* No. 39), Song: This is Why Your Joy (*তাই তোমার আনন্দ* No. 56), My Song Has Cast off (*আমার এ গান ছেড়েছে তার* No. 7), The Day I Go (গীতাঞ্জলি ১৪২ No. 96)।

একালের অনুবাদকরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যভুবনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টির সীমানায় রেখে কবিতা নির্বাচন করেন। তাঁদের পরিকল্পনার পিছনে অনেক বিচার-বিবেচনা চিন্তাভাবনা থাকে। ঔচিত্যবোধ এবং সম্ভব-অনতিসম্ভবের মীমাংসা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা সাধ্য-অসাধ্যের শর্ত, এসবের কিছু প্রভাব এসে পড়ে নিশ্চয় কাজের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথকেও বেছে নিতে হয়েছিল। তবে *Gitanjali*-র ক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচনের সীমানা তুলনায় অনেক ছোটো। দু-পাঁচটা পুরোনো কাব্যগ্রন্থ থেকে নিয়ে অনুবাদ করেছিলেন, তাছাড়া আর সবই প্রায় সে-সময়কার সবচেয়ে শেষদিককার কবিতা। তারপরেও সম্পাদক কবি ইয়েটস্‌কে ঝাড়াই-বাছাই করতে হ'ল দুখানা অনুবাদভরা নোটখাতা থেকে, আরও বেশ কিছু ইংলন্ডে পৌঁছোবার পরে খুচরো কাগজে-করা অনুবাদ থেকে। তবে খাড়া হল ক্ষীণাঙ্গী *Gitanjali Song Offerings,* তারই দাপটে সারা পৃথিবী তোলপাড়। সম্পাদক হয়তো একশ কবিতার সংকলন করতে চেয়েছিলেন, কী জানি, হয়তো অপ্রতিরোধ্য দাবিদার হয়ে ঢুকে পড়েছিল আরও তিনটি।

আমার এ বইয়ের কেন্দ্রে ওই বই। তার আনুপূর্বিক ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা করেছি যে, তা নয়। প্রায় শতবর্ষ আগে পিছনে-ফেলে-আসা একটা খণ্ডকালের সঙ্গ পেতে চেয়েছিল মন। সেই ১৯১২ সালের মে মাসে ইংলন্ডের উদ্দেশে সমুদ্রপাড়ি দিলেন রবীন্দ্রনাথ, ফিরলেন পরের বছর সেপ্টেম্বরের শেষে। প্রবাসের সেই দিনগুলো কেমন কাটল তাঁর, কী পেলেন, কী দিলেন—জানি, অনেক বইতেই সে-সব তথ্য আছে। তারই কোনো কোনোটি থেকে আমিও রসদ সংগ্রহ করেছি। ওই যা বললাম, আমার আলোচ্য শুধু *গীতাঞ্জলি* থেকে *Gitanjali*, তাঁর এবারের প্রবাসী জীবনের সবটা এর আওতায় আসে নি। তারপরে বছরান্তে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা শুরু হল যখন, তাঁর জাহাজ ভারতের মাটি স্পর্শ করবার আগেই কথা থেমেছে আমার।

গীতাঞ্জলির নবজন্মের দিনগুলো স্মরণ করতে করতে আমারও মানসযাত্রার কালটা আনন্দে কেটেছে। সেই একদিন— শতবর্ষ আগে 'হৃদয় মগন গানে' জেগেছিলেন এক কবি, জাগিয়ে দিয়েছিলেন কত না মনকে।

শেষের মধ্যে অশেষ হয়ে থাকে *গীতাঞ্জলির* গান, তার আবেদন ফুরোয় না। একদিন এইসব রচনা কাঁদিয়েছিল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মতো, আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো মানুষকে। ভিক্টোরিয়া পড়েছিলেন জিদের করা ফরাসি, সেনোরিয়া কামপ্রুবি হিমেনেথের করা স্প্যানিশ অনুবাদ, ইংরেজি *Gitanjali* পড়তেও বাধা হয়নি। আইয়ুব মাত্র তেরো বছর বয়সে পড়েছিলেন ইংরেজি থেকে নেয়াজ ফতহ্‌পুরীর করা চমৎকার উর্দু অনুবাদ। আরও বছর তিনেক পরে ইংরেজি অনুবাদ পড়ে আগের মতোই সজল হল চোখ, মোহিত হল মন। তখন আর তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী নন, ঘোর নাস্তিক। সংকল্প করলেন বাংলা শিখে মূল *গীতাঞ্জলি* পড়বেন। নিজেকে প্রশ্ন করলেন : 'যে ঈশ্বরকে আমি কায়মনোবাক্যে অলীক ব'লে জানি, সেই ঈশ্বরভাবে ভরপুর কাব্যে মন কেন সাড়া দেয়?' কাব্যের সেই সংরক্ত আবেদনের কথা ভাবছিলেন আইয়ুব, যে আবেদনে সমস্ত মন-প্রাণ মুচড়ে ওঠে। এমন সব কত অনুভব কত উপলব্ধির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে *গীতাঞ্জলির* কবিতা পড়া, কত প্রশ্ন আর তার উত্তর খোঁজা, তত্ত্বব্যাখ্যার চেষ্টা কত।

Helene Meyer-Franck, পরে যিনি জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদক হন, *Gitanjali* পড়ে তাঁর জীবনের গতি পাল্‌টে গিয়েছিল। From that day Rabindranath Tagore has been the light of our home and the treasure of our hearts. তারপরে যখন *Sadhana* পড়লেন, *Nationalism* পড়লেন, Rabindranath Tagore actually became the centre of my life.

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, মানুষের কাছে কবি যা পেতে পারেন তা শ্রদ্ধা ভক্তি নয়, শুধুই হৃদয়ের প্রীতি। তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে সম্বর্ধনা দিলেন যখন, সেই সভায় তিনি একথা বলেছিলেন তাঁর ভাষণে। বলেছিলেন, 'সম্মান যেখানে মহৎ, যেখানে সত্য, সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়।' *Gitanjali*-র বিনিময়ে বিদেশের মানুষের কাছ থেকে সেই কবির প্রাপ্য অকৃত্রিম প্রীতি নিয়ে তিনি ফিরেছিলেন। 'যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম'— পশ্চিম সাগরকূলে সে উপহার সমাদর লাভ করেছিল, সম্মান লাভ করেছিলেন কবি। নিজের ঘরের উজ্জ্বল আলোয়-ভরা স্নিগ্ধ আবেষ্টনে ফিরলেন। কৃষ্ণ কৃপালনির লেখায় পড়ি, কবি যা সংগ্রহ করে এনেছেন সে ধন-মান নয়, সে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে সম্পন্ন মনের বন্ধুত্ব। প্রত্যাবর্তনের কয়েক সপ্তাহ পরে ২০ অক্টোবর ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন রোটেনস্টাইনকে, '. . . I cannot but marvel at the fact that my best friends are in England and it took some weeks for me to adjust my mind to my old familiar surroundings where you were absent.'

সেই কবেই তো তাঁর মন বলেছিল 'দেশে দেশে মোর দেশ আছে', 'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়'— সেও যেমন সত্য এই চিঠির দুদিন আগেই যে তিনি লিখছিলেন, 'আমার যে আসে কাছে যে যায় চলে দূরে/কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে', সেও তেমনি।

বৎসরান্তে এই মনই ভাববে বসে:

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

শ্রাবণ ১৪১৭
কলকাতা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

কবি এক জাগে

পশ্চিমি বিশ্বের অনেক মানুষের কাছে ক্যালকাটা এবং বেঙ্গলের পরিচয় অজানা ছিল না, তবু চমকটা সামান্য হয়নি। একে তো ব্রিটিশ ভারতের এক প্রাদেশিক ভাষার কবি, তার উপরে তাঁর শ'খানেক কবিতার নিজেরই করা সরল গদ্যানুবাদের এক ক্ষীণাঙ্গী সংকলন *Gitanjali (Song Offerings)*। সেই বই যে প্রকাশের পরে বছর না ঘুরতেই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান পেল, এমন আশ্চর্য ঘটনা তো জগৎসংসারে রোজ রোজ ঘটে না। বিশ্বসভায় স্থান পাবার ঢের আগেই কবি ও তাঁর কাব্য যখন ইংরেজ ভাবুক সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে, তখন সেই কবির ভালোও লাগছিল, আবার নিজের নামের এই ঢেউ-তোলা অস্বস্তিতেও ফেলেছিল। আর যখন নোবেল প্রাইজ পেয়ে খ্যাতির স্রোতে ভেসে যাবার উপক্রম, মনে হচ্ছিল কুকুরের লেজে একটা টিন বেঁধে দিলে সেটা যেমন চলতে-ফিরতে যথেচ্ছ আওয়াজ করে বেচারাকে অস্থির দিশাহারা করে তোলে, তাঁরও সেই দশা হয়েছে।

জীবনে এমন একটা অভাবিত ঘটনা যে ঘটে গেল, তার অব্যবহিত আগে পর্যন্ত তিনি একেবারেই বঙ্গভাষার এক কবি। বাংলা দেশের বাইরে তাঁর পরিচিতি প্রায় নেই বললেই চলে। 'বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা'— সত্য হয়ে উঠুক, তারই জন্য কাজ করেছেন, স্বজাতিকে তারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ সত্ত্বেও বাঙালির কবি নন তিনি কোনোদিনই। প্রবীণ বয়সে বলেছিলেন:

আমি পৃথিবীর কবি যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,

পৃথিবীর কবি তিনি নবীন বয়সেও। মুক্ত আকাশে পক্ষবিস্তার করেছে তাঁর কবিসত্তা, দেশখণ্ডের সীমানায় বদ্ধ নয় সে, বিশ্বজোড়া ফাঁদ পাতা তার জন্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রহর তখন। জমিদারি তত্ত্বাবধানের কাজে প্রায়ই তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয় পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। নানা উপলক্ষে কলকাতায় আসাযাওয়াও করতে হয়, তবে কাজকর্মের আড়ালে অন্তর-উজ্জীবনের ও সাহিত্যচর্চার আসন তাঁর পাতা হয়েছে প্রধানত নাগরিক কোলাহল থেকে বহুদূরে বাংলার উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির নিভৃত সান্নিধ্যে। সেইখানে নিজের সঙ্গে তাঁর নিয়ত বোঝাপড়া। বৈরাগ্যসাধন তাঁর জন্য নয় অবশ্য, সমাজ-সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির সন্ধান করেন তিনি। দশের কাছে খ্যাতি সম্মান যেমন পান, সমালোচনা ব্যঙ্গ বিরুদ্ধতার স্রোতও অবিরত আঘাত হানে। তবে অনুরাগী বন্ধুরাও সংখ্যায় কম নন, তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁদের ভালোলাগা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরেও তাঁদের নানা দাবি, নানা প্রত্যাশা। সে দাবি ও প্রত্যাশাকে যথাসাধ্য মর্যাদা দেন কবি। বঙ্গসমাজ ও বঙ্গসাহিত্যের জন্য প্রয়োজনবোধ করলে অমিত্ররাও তাঁর সামনে হাত পেতে দাঁড়াতে দ্বিধা করেন না।

নানা কাজে ব্যস্ত কবি, স্বদেশ ও সমাজের দুর্গতি ঘোচাতে সক্রিয় কবি, সাংসারিক ভাবনায়, আর্থিক চিন্তায় উদ্বিগ্ন কবি, লোকচক্ষুর অগোচরে দিগন্ত প্রসারিত আপন নিরালায় নিমগ্ন কবি। তারই মধ্যে শান্তিনিকেতনে ছোটো একটি বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছাটা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠছিল ভিতরে ভিতরে।[১] কত যে বিচিত্র পথে মন ছুটছে তার ইয়ত্তা নেই, তবে তখনও সে ভিন্ন ভাষার নির্মোকে নিজের সৃষ্টিকে দেখার কথা ভাবছে না। বৃহত্তর জনমানসের কাছে পৌঁছোবার কোনো তাগিদ নেই। এমন একটা চেষ্টা যে করা যেতে পারে সম্ভবত সে কথাটা প্রথম ভাবলেন কবির বিজ্ঞানীবন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু।[২]

শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর কি আর যেখানেই থাকুন, কাছে দূরের সব খবরই পৌঁছোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে। জগদীশচন্দ্র তখন বিদেশে। প্রতিকূলতার অনড় বাধা ঠেলে বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় নিজের নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে তাঁর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর খবরের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। দুই বন্ধুর মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়। এমনই এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদের প্রসঙ্গ তুললেন। চিঠির তারিখ ২ নভেম্বর ১৯০০:

> তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। লোকেনকে[৩] ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানালেন তাঁর দুখণ্ড গল্পসংকলন জগদীশচন্দ্রকে পাঠাবেন। প্রথম খণ্ডের তর্জমাযোগ্য কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করলেন; 'পোস্টমাস্টার', 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'কাবুলিওয়ালা' এবং 'প্রতিবেশিনী'। সম্ভাব্য অনুবাদক প্রসঙ্গেও দুজনের মধ্যে কিছু কথা হল। অনুবাদের কাজে লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে পাবার ভরসা ছিল না রবীন্দ্রনাথের। লিখলেন:

> লোকেনকে আমার গল্প তর্জমার জন্যে ধরেছি— কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেইজন্যে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করতে পারিনে। ২০ নভেম্বর ১৯০০ (৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৭)

আবার জগদীশচন্দ্র যে ইংরেজ মহিলার কথা এ কাজের জন্য ভাবছিলেন, তাঁর যোগ্যতা নিয়েও কবি সন্দিহান। ২৩ নভেম্বর ১৯০০ তারিখের এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্র তাঁকে লিখেছিলেন:

> তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেননা। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানিনা।

দুই খণ্ড গল্পসংকলন থেকে জগদীশচন্দ্রের অনুবাদের জন্য গল্প নির্বাচনের সুবিধা হবে, রবীন্দ্রনাথের ১২ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখের চিঠিতে একথা ছিল। তবে ভাষান্তরে তাঁর সৃষ্টির সামগ্রিক রূপ অক্ষুণ্ণ রাখা কেন সম্ভব নয়, সে প্রসঙ্গও এসে গেল:

> আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ— কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল— ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের

> কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ— জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গল্প অনুবাদে জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা এবং চেষ্টার প্রসঙ্গ পরের বছরের চিঠিতেও সজীব। একটি চিঠি আছে ১৯ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখে লেখা। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পূর্বচিঠির উত্তর। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে গল্পসংকলন প্রথমখণ্ড পৌঁছেছে, গল্পও অনূদিত হয়েছে।

> তোমার গল্পের পুস্তক ২য়খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি গল্প তর্‌জমা হইয়াছে।[৪] ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়। সে সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই।

কয়েকটি অনুবাদগল্প নিয়ে বইপ্রকাশের আগ্রহ থাকলেও তাঁর নিজেরই দ্বিধা ছিল। আগেই রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'Publisherরা ফাঁকি দিতে চায়।' সাময়িকপত্রে প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেও বিফল হলেন। ২২মে ১৯০১ রবীন্দ্রনাথকে তাই লিখলেন:

> তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন ম্যাগাজিনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, গল্প অতি সুন্দর; কিন্তু Original ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির করি না। তোমার নাম জাল করিতে যদি অধিকার দাও, তাহা হইলে অনুবাদের কথা না বলিয়া একবার তোমার নাম দিয়া পাঠাইতে পারি। কি বল?

এমনই নানা টানাপোড়েনের মধ্যে বিদেশীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেবার চেষ্টা এই সময় ব্যর্থ হলেও তখন থেকেই কবির নিজের শহরের ইংরেজি পত্রিকায় তাঁর রচনার একটি-দুটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে। অবশ্য প্রথম দিকে প্রকাশের ধারা যে অব্যাহত গতিতে চলেছিল তা নয়।

পথিকৃতের মর্যাদা প্রাপ্য বিপিনচন্দ্র পাল[৫] সম্পাদিত নিউ ইণ্ডিয়া (New India) পত্রিকার। এই পত্রিকার প্রথম বছরের ষষ্ঠ সংখ্যায় গল্পের অনুবাদ প্রথম বেরিয়েছিল। গল্পের নাম 'সুভা', অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন বাগচী[৬] এবং ১৯০১ সালের ১২ আগস্ট ও ১৬ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় দুই কিস্তিতে এটি প্রকাশিত হয়।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ সার্ধশতবার্ষিকী (১৮৫৩-২০০৩) গ্রন্থে গুরুদাস সরকার তাঁর 'অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল' রচনায় স্মরণ করেছেন তাঁরা পাঁচ বন্ধু মিলে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প অনুবাদ করেন, নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকায় সে গল্প প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরই নামে। চট্টগ্রামের আইনজীবী রজনীরঞ্জন সেন রবীন্দ্রনাথের তেরোটি গল্পের অনুবাদ সংকলন *Glimpses of Bengali Life* ১৯১৩ সালের জুন মাসে প্রকাশ করেন। গল্পগুলি প্রায় সবই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ ভূমিকায় তিনি লেখেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই গল্পগুলি প্রকাশের জন্য প্রায় চার বছর আগে অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৯০১-১১ পর্যন্ত রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের প্রথম যুগ ধরা যায়। গল্পের অনুবাদই প্রাধান্য পেয়েছে এই সময়। মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রগল্পের অনুবাদ প্রথম বেরোয় ডিসেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায়। ক্রমে তাঁর সাহিত্যবিষয়ক, ভারতচর্চাবিষয়ক প্রবন্ধের অনুবাদেরও দেখা পাওয়া যেতে লাগল।

মডার্ন রিভিউ আগস্ট ১৯১০ সংখ্যায় প্রকাশিত The Problem of India অন্যকৃত অনুবাদ নয়, তাঁর নিজেরই একটি চিঠি। নিউ ইয়র্কের আইনজীবী Myron H. Phelps-কে[৭] ভারত সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ৪ জানুয়ারি ১৯০৯ তিনি লিখেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সময়ে সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ইংরেজি ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার তাঁর নেই, চিঠিতেও লিখেছেন সেকথা। Phelps-কে ইংরেজি ভাষায় ভাবপ্রকাশে নিজের অনৈপুণ্য প্রসঙ্গে তিনি লেখেন:

> In regard to the assistance you expect from me, I am afraid that as I have never used to express myself in the English language I shall not be able to give an adequate or effective idea of what I feel to be the truth about our country.

বছর দেড়েক পরে মডার্ন রিভিউ-তে প্রকাশের জন্য এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে[৮] লিখলেন:

> Myron Phelps-কে যে ইংরাজি চিঠিখানা বৎসরখানেক হল লিখেছিলুম তার একটা type written copy পেয়েছি। এটা রামানন্দ বাবুকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কোরো Modern Review-তে এর স্থান হতে পারে। এর ভাষা বানান punctuation সমস্তই তাঁকে দেখে দিতে হবে। Copyistও কিছু কিছু ভুল করেছিল— যতটা পারলুম সংশোধন করে দিলুম। ইংরাজি ভাষার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করে এবং দুই একজন আত্মীয় বন্ধুর সাহায্য নিয়ে এটা আমাকে লিখতে হয়েছিল— মনের ভাব একরকম ব্যক্ত করেছি— যদি ছাপা সম্ভব হয় তো ছাপতে দিয়ো নইলে আমি যেন অবিলম্বে ফিরৎ পাই। যদি কোনো অংশ পরিত্যাগ বা বিশেষ ভাবে পরিবর্তন করলে ভালো হয় তাহলে রামানন্দবাবু নির্মমভাবে তা করবেন— আমি তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি— কিন্তু ছাপার পূর্বে সংশোধনটা আমি দেখতে পাই যেন। ৮ জুলাই ১৯১১

এই লেখার প্রুফ দেখার পরে প্রায় একই মর্মে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে[৯] ৯ শ্রাবণ ১৩১৭ লিখলেন:

> আমার লিখিত ইংরেজি পত্রখানি Modern Review পত্রে ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন— আশা করি বিচারে ভুল করেন নাই।
>
> প্রুফে দ্বিতীয় গেলির শেষ প্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করিয়াছি। ইহার ভাষা ব্যাকরণ পদচ্ছেদ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন আছি— দয়া করিয়া যথেচ্ছা সংশোধন করিয়া দিবেন। ২৫ জুলাই ১৯১০

রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামীর[১০] যুগ্মনামে 'বিদায়' কবিতার অনুবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রিকার এপ্রিল ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর আগে মার্চ ১৯১১ সংখ্যায় অজিত কুমার চক্রবর্তী[১১] ও কুমারস্বামীর যুগ্মনামে 'জন্মকথা'-র অনুবাদ বেরিয়েছিল এই পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ সেই প্রথম বেরোল। এরপর একে একে আরও বেরোতে থাকে কবিতার অনুবাদ। মে ও আগস্ট সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয় Fruitless cry (নিষ্ফল কামনা)[১২] এবং The death of a star (তারকার আত্মহত্যা), অনুবাদক লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

কুমারস্বামীর সঙ্গে যুগ্মনামে প্রকাশিত 'জন্মকথা' ও 'বিদায়' কবিতা দুটির প্রকাশপূর্ব নেপথ্যের একটু খবর দিয়ে যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ২০ফেব্রুয়ারি ১৯১১ তারিখে এই প্রসঙ্গে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি।

> কুমারস্বামী আশ্রমে আসিয়াছিলেন— তিনি আমার কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন— সেইজন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আমি তাড়াতাড়ি গোটা তিনচার কবিতা নিতান্ত নীরস গদ্যে তর্জমা করিয়া দিয়াছিলাম। কুমারস্বামী যদি সেগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিয়া দেন তবে Modern Review পত্রিকায় ছাপাইবেন। তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়া আসিলে আমার আপত্তির কারণ থাকিবে না। অজিত কতগুলি তর্জমা করিয়াছিল— সেও কুমারস্বামীর হাতে আছে— তিনি যাহা ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া আপনার হাতে দিবেন তাহা আপনি প্রকাশ করিবেন। কিন্তু স্বকৃত তর্জমার বিড়ম্বনাগুলিকে কুমারস্বামী মাজিয়া ঘসিয়া দিলে তাহাতে অনুবাদক বলিয়া আমার নাম সংযোগ করা সঙ্গত হইবে না।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনা ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরের চেষ্টা এমনি মন্থর গতিতে আরম্ভ হয়েছিল, সেই পরিকল্পনাহীন চেষ্টা ছিল খানিকটা পত্রিকার চাহিদা পূর্ণ করার জন্য, এবং অনেকটাই ব্যক্তি-অনুবাদকের ইচ্ছানির্ভর। ১৯১১ সালের আগে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তাঁর কোনো গান বা কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি।[১৪] যে কথা একটু আগে বলছিলাম, অনেক দিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনা। কুমারস্বামীর সঙ্গে যুগ্মনামে *শিশুর* 'বিদায়' কবিতার অনুবাদ Farewell মুদ্রিত হল পত্রিকায়, ওই পর্যন্তই। নইলে এদিকটায় তখনও কবির মনোযোগ দেবার অবকাশও নেই, ইচ্ছার বেগও তেমন তীব্র নয় এবং এ কাজে হাত দিতে সংকোচও যথেষ্ট। এমন সময় অলক্ষিতে কখন যে একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কেউ টের পায়নি। কবি নিজেও না।

তাই ১৯১২ সালের মাঝামাঝি ইংলন্ডে পৌঁছাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে দেশের সুধীসমাজে বিশিষ্ট কবি রূপে যে সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করলেন, সে শুধু তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের কাছে কেন তাঁর নিজের কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল।[১৫] ১৭ অক্টোবর ১৯১২ তাঁর জ্যোতিদাদাকে[১৬] লেখা এক চিঠিতে তিনি সেই আকস্মিক ঘটনার কথা বলেছেন। India Society সংস্করণ *Gitanjali*-র প্রকাশ তখন আসন্ন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> আমার বইখানা আর সপ্তাহখানেক পরে বের হবে। দেখে যেতে পারলুম না।. . . বই বের হলে আপনারা পাবেন— এইখান থেকেই এরা পাঠিয়ে দেবে। এ বই এদের কেন এত অত্যন্ত ভাল লেগেছে তা ঠিক বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। বিশেষত তর্জমা আমার নিজের ইংরেজিতে এবং সেও সরল গদ্যে। যে কবিতাগুলি তর্জমা করেছি সে সমস্তই আমার শেষ বয়েসের— তার মধ্যে কবিত্বের কোনো নৈপুণ্য নেই— দেশে তার কোনো আদরও হয়নি— বরঞ্চ লোকে এই কথাই মনে করেছে এই কবিতায় আমার কবিত্বশক্তির ম্লান দশাই প্রমাণ করছে। ১ কার্তিক ১৩১৯[১৭]

পাশ্চাত্যদেশ নতুন করে আবিষ্কার করল এই কবিকে, তাঁর কবিত্বশক্তির অগাধ ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হল। বলল, এমন এক মহান কবির আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল সে এতদিন। স্টপফোর্ড ব্রুকের[১৮] অনুভবী মন দূরের পটে রেখে এই কবিতাগুচ্ছের মূল্যনির্ধারণ করছিল, বই প্রকাশের তখনও বেশ দেরি।